জিরো

অধ্যায় ছয়

অসীমের যমজ

[শূন্যের অসীম বৈশিষ্ট্য]

ঈশ্বর পূর্ণসংখ্যা সৃষ্টি করেছেন। বাকি সব মানুষের কর্ম।

-- লিওপোল্ড ক্রোনেকা

শূন্য আর অসীমকে সবসময় সন্দেহজনকভাবে সমজাতীয় মনে হচ্ছিল। কোনোকিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ দিন। পাবেন শূন্য। অসীমকে কোনোকিছু দিয়ে গুণ দিলেও শূন্য। কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে আসবে অসীম। আর অসীম দিয়ে ভাগ দিলে শূন্য। কোনো সংখ্যার সাথে শূন্য যোগ করলে তাতে কোনো পরিবর্তন আসে না। অসীমের সাথেও কাউকে যোগ করলে কোনো পরিবর্তন নেই।

রেনেসাঁর সময় থেকেই এ মিলগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তবে শূন্যের বড় রহস্য উন্মোচন করতে গণিতবিদদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ফরাসি বিপ্লব শেষ হওয়া পর্যন্ত।

শূন্য আর অসীম একই মুদ্রার দুই পিঠ। সমান ও বিপরীত। ইন ও ইয়াং১। সংখ্যারেখার দুই মাথায় সমশক্তিমান দুই প্রতিপক্ষ। শূন্যের ঝামেলাময় বৈশিষ্ট্য তাল মিলিয়ে চলে অসীমের অদ্ভুত ক্ষমতার সাথে। শূন্যকে বুঝতে পারলেই অসীমকেও বোঝা সম্ভব হয়ে যায়। এটা বুঝতে গিয়ে গণিতবিদদের পা দিতে হয় কাল্পনিক এক অদ্ভুত জগতে। যেখানে বৃত্তরা রেখা, রেখারা বৃত্ত। আর অসীমের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে।

স্বর্গীয় চেতনার এক দারুণ ও বিস্ময়কর আশ্রয়স্থল। অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের প্রায় মিলন যেখানে।

-- গটফ্রিড উইলহেল্ম লাইবনিৎস

বহু শতক ধরে গণিতবিদদের অবহেলার পাত্র শূন্য একা হয়নি। শূন্য যেভাবে গ্রিকদের কুসংস্কারের আগুনে পুড়েছে, অন্য সংখ্যাও হয়েছে অবহেলার শিকার। যে সংখ্যাদের ছিল না জ্যামিতিক অর্থ (গ্রিকরা সংখ্যার জ্যামিতিক দিকটাই বুঝত শুধু)। এমন একটি সংখ্যা i। শূন্যের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের মূলে এ সংখ্যাটারও ভূমিকা আছে।

বীজগণিতের মাধ্যমে সংখ্যাকে বোঝার আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া গেল। যা গ্রিকদের জ্যামিতিক ধারণা থেকে পুরোপুরি আলাদা। গ্রিকদের মতো পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফল পরিমাপের বদলে বীজগণিতবিদরা বিভিন্ন সংখ্যার সম্পর্কের সমীকরণের সমাধান খোঁজার পথে হাঁটলেন। যেমন 4x – 12 = 0 সরল সমীকরণটির কথা ভাবুন। এ সমীকরণ বলছে ০, ৪ ও ১২-এর সাথে অজানা সংখ্যা x-এর সম্পর্ক। বীজগণিতের ছাত্রের কাজ হলো x-এর মান ব বের করা। এ সমীকরণে x-এর মান ৩। সমীকরণে x-এর বদলে ৩ বসিয়ে দেখুন সমীকরণ শুদ্ধ হচ্ছে। 4x – 12 = 0 সমীকরণের সমাধান বা মূল ৩।

বিভিন্ন চিহ্নকে জোড়া দিয়ে সমীকরণ বানাতে থাকলে অপ্রত্যাশিত জিনিসের মুখোমুখি হতে হয়। যেমন ওপরের সমীকরণে বিয়োগ চিহ্ন (-) উঠিয়ে যোগ চিহ্ন (+) বসিয়ে দিন। পাওয়া যাবে সরল-দর্শন এক সমীকরণ: 4x +12 = 0। তবে এ সমীকরণের সমাধান (-৩), যা ঋণাত্মক সংখ্যা।

ভারতীয় গণিতবিদরা যখন শূন্যকে গ্রহণ করলেন, ইউরোপীয়রা বহু শতক ধরে একে অবজ্ঞা করে গেছে। একইভাবে প্রাচ্য যখন ঋণাত্মক সংখ্যাকে বুকে টেনে নিল, পশ্চিম তাকেও অবহেলা করতে চাইল। এমনকি সতের শতকে এসেও ডেকার্ট সমীকরণের সমাধান হিসেবে ঋণাত্মক সংখ্যাকে মেনে নিতে রাজি হননি। তিনি এদেরকে নাম দেন নকল সমাধান বা মূল। আর ঠিক এ কারণেই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাকে ঋণাত্মক সংখ্যা পর্যন্ত বর্ধিত করেননি। তবে ডেকার্ট সংকীর্ণ ধারণার পতন যুগের মানুষ। বীজগণিত ও জ্যামিতির মিলনের সফলতার শিকার তিনি। বীজগণিতবিদদের কাছে ঋণাত্মক সংখ্যা অনেক আগেই থেকেই কাজের জিনিস। পশ্চিমের গণিতবিদরাও কাজে লাগিয়েছেন সংখ্যাগুলোকে। সমীকরণ সমাধান করতে গেলে হরদম দেখা মিলছিল ঋণাত্মক সংখ্যার। এমন এক ধরনের সমীকরণ হলো দ্বিঘাত (quadratic) সমীকরণ।

4x – 12 = 0 ধরনের সরলরৈখিক সমীকরণ সমাধান করা খুব সহজ। তবে এ ধরনের সমস্যা বীজগণিতবিদদের বেশিদিন ব্যস্ত রাখতে পারল না। তাদের চাই আরও কঠিন সমস্যা। কাজ শুরু করলেন দ্বিঘাত সমীকরণ নিয়ে। এ সমীকরণ শুরু হয় x2 দিয়ে। যেমন x2 – 1 = 0। সাধারণ সমীকরণের চেয়ে এরা জটিল। প্রথমত, এদের মূল থাকে দুটি। যেমন x2 – 1 = 0 এর মূল দুটি হলো ১ ও (-১)। সমীকরণে 1 বা (-1) বসিয়ে দেখুন কী হয়। ফলে সমীকরণে ১ বা (-১) দুটোই কাজ করে। x2 – 1 থেকে আমরা পাই (x + 1)(x – 1), যা থেকে বোঝা যায় ১ বা (-১) বসালে রাশিটা শূন্য হয়।

দ্বিঘাত সমীকরণ সরলরৈখিক সমীকরণের চেয়ে জটিল হয়ে এদের মূল বের করার একটি সহজ উপায় আছে। একে বলে দ্বিঘাত সূত্র, যা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা যেকোনো শিক্ষার্থী গুরুত্বসহকারে পড়ে। ax2 + bx + c দ্বিঘাত সমীকরণের মূল হবে x = (- b ± √(b2 – 4ac))/2a। ধনাত্মক চিহ্ন (+) থেকে একটি ও ঋণাত্মক চিহ্ন (-) থেকে পাই আরেকটি মূল। বহু বছর ধরে মানুষ দ্বিঘাত সমীকরণের কথা জানে। নবম শতকের গণিতবিদ খোয়ারিজমি প্রায় সব দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান করতে পারতেন। তবে তিনি ঋণাত্মক সংখ্যাকে সম্ভবত মূল হিসেবে মানতেন না। তবে তারপর দ্রুতই ঋণাত্মক সংখ্যাকে সমাধান হিসেবে গ্রহণ করে নেন বীজগণিতবিদরা। তবে কাল্পনিক সংখ্যার কথা একটু আলাদা।

সরলরৈখিক সমীকরণে কাল্পনিক সংখ্যা আসে না। তবে দ্বিঘাত সমীকরণে এদের দেখা যেতে থাকল। x2 + 1 = 0 সমীকরণটার কথা ভাবুন। দেখে মনে হয় কোনো সংখ্যা বসিয়েই এর সমাধান পাওয়া যাবে না। -1, 3, 500 বা 30.24 যাই বসান সমীকরণ সিদ্ধ হবে না২। আপনার ইচ্ছামতো যেকোনো ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যাই বসান না কেন, এ সমীকরণের মূল পাবেন না। এর চেয়ে করুণ কথা হলো, দ্বিঘাত সমীকরণ প্রয়োগ করতে গেলে দুটি অদ্ভুত উত্তর মেলে। +√(-1) ও -√(-1) ।

দেখে এদের কোনো অর্থ আছে বলে মনে হয় না। বার শতকে ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্কর বলেছিলেন, ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল নেই। কারণ ঋণাত্মক সংখ্যা বর্গসংখ্যা নয়। ভাস্কর এবং অন্যরা বুঝতে পেরেছিলেন, ধনাত্মক সংখ্যার বর্গ ধনাত্মক। ২-কে ২ দিয়ে গুণ করলে ৪ হয়। ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গও ধনাত্মক। (-২)-একে (-২) দিয়ে গুণ করলেও ৪ হয়। শূন্যের বর্গ শূন্য। ধনাত্মক সংখ্যা, ঋণাত্মক সংখ্যা ও শূন্য সবাই অঋণাত্মক বর্গ দেয় ফল হিসেবে। পুরো সংখ্যারেখা এই তিনটি সম্ভাবনা দিয়েই পূর্ণ। তার মানে, সংখ্যারেখায় এমন কোনো সংখ্যা নেই, যাকে বর্গ করলে ঋণাত্মক সংখ্যা আসবে। ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গকে মনে হচ্ছিল হাস্যকর এক ভাবনা।

ডেকার্ট এ সংখ্যাদের ঋণাত্মক সংখ্যার চেয়েও খারাপ মনে করতেন। ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলের একটি তুচ্ছ নামও দেন তিনি: কাল্পনিক সংখ্যা (imaginary number)। এ নামটিই পরে থেকে যায়৩। (-১) এর বর্গমূলের প্রতীক এখন i।

বীজগণিতবিদরা i-কে ভালবাসলেন। বাকি প্রায় সবাই একে ঘৃণা করলেন। x3 + 3x + 1 রাশিটির মতো বহুপদীর সমাধানে কাল্পনিক সংখ্যা দারুণ কাজে লাগল। আসলে i-কে সংখ্যা হিসেবে মেনে নিলে সব বহুপদী সমাধান করা যায়। x2 + 1 ভাগ হয়ে হয় (x + i)(x - i)। সমীকরণের মূল হয় i ও (-i)। x3 – x2 +x – 1 এর মতো ত্রিঘাত সমীকরণ ভাগ হয় তিনভাগে। (x – 1) (x + i) (x- i)। x4 দিয়ে শুরু চতুর্ঘাতী রাশি ভাগ হয় চারভাগে। x5 দিয়ে শুরু পঞ্ছঘাতীরা পাঁচ ভাগে। n ঘাতের বহুপদীরা শুরু হয় xn দিয়ে, আর এরা বিভক্ত হয় n টি আলাদা (অনেকসময় দুই মূল একই হতে পারে। যেমন x2 – 2x + 1 = 0 বা (x-1)2 = 0 সমীকরণের দুটি মূলই ১। তবে মূলের সংখ্যা কিন্তু ২-ই।) রাশিতে। একে বলে বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্য।

ষোলো শতকের শুরু থেকেই গণিতবিদরা i-যুক্ত সংখ্যা ব্যবহার করছিলেন। ত্রিঘাত ও চতুর্ঘাতী সমীকরণ সমাধান করতে গিয়ে তথাকথিত এই জটিল৪ সংখ্যাদের ব্যবহার চলে আসে। অনেক গণিতবিদ জটিল সংখ্যাকে একটি সুবিধাজনক কল্পনা হিসেবে মেনে নেন। তবে এর মধ্যেই বাকিরা খুঁজে পান ঈশ্বরকে।

লিবনিজ মনে করতেন, i হলো অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মাঝে এক অদ্ভুত মিলন। অনেকটা যেন তাঁর বাইনারি৫ সংখ্যার ১ (ঈশ্বর) ও ০ (শূন্যতা) এর মিলন। লিবনিজ i-কে পবিত্র আত্মার৬ সাথে তুলনা করেন। দুটোরই অস্তিত্ব অবস্তুগত ও নামে মাত্র মূর্ত। তবে এমনকি লিবনিজও বুঝতে পারেননি একসময় শূন্য ও অসীমের সম্পর্ক প্রকাশ করবে i। তবে সে সম্পর্কের জট খুলতে গণিতে আরও দুটো গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি প্রয়োজন হয়েছিল।

বিন্দু ও প্রতিবিন্দু

এ ধারণাগুলো কত সহজে পরিচিত বৈশিষ্ট্য ও আরও অসীমসংখ্যক জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে তা তখন সহজেই বোঝা যাবে, সাধারণ জ্যামিতি সহজে সহজে যার ঠাঁই খুঁজে পায় না।

-- জঁ ভিক্টর পঁসলে

প্রথম অগ্রগতি ছিল প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতি (projective geometry)। শাখাটার জন্ম যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে। ১৭০০ সালের প্রথম দশকের কথা। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, নেদারল্যান্ড ও অন্যান্য দেশ ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত। একের পর এক জোট গড়ছে ও ভাঙছে। বিভিন্ন উপনিবেশ নিয়ে তৈরি হচ্ছে আঞ্চলিক বিবাদ। দেশগুলো নিউ ওয়ার্ল্ডের (নতুন আবিষ্কৃত অ্যামেরিকা মহাদেশ) সাথে বাণিজ্যিক আধিপত্য ধরে রাখতে লড়ছে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধজুড়ে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশ খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হতে থাকে। নিউটন মারা যাওয়ার প্রায় সিকিশতক পরে যুদ্ধ পুরোদমে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্পেন ও রাশিয়া ইংল্যান্ড ও প্রুশিয়ার সাথে লড়ে নয় বছর।

১৭৬৩ সালে ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করে। অবসান হয় সাত বছরের যুদ্ধের (যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হওয়ার আগেই দুই বছর যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল)। যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে ইংল্যান্ড গুরতপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তবে তার জন্য মূল্যও দিতে হয়। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড দুই দেশই নিঃস্ব হয়ে যায়। জর্জরিত হয় ঋণের ভারে। দুই দেশই পরিণতিও ভোগ করে। ঘটে বিপ্লব। সাত বছরব্যাপী যুদ্ধের এক দশকের কিছু পরে শুরু হয় মার্কিন বিপ্লব। ইংল্যান্ড হারায় তার সবচেয়ে বড় উপনিবেশ। ১৭৮৯ সালে জর্জ ওয়াশিংটন নতুন জন্ম নেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের শাসন শুরু করেন। আর ওদিকে শুরু হয় ফরাসি বিপ্লব। চার বছর পরে বিল্পবীরা ফরাসি রাজার গর্দান কেটে ফেলে।

গ্যাসপা মঞ্জ নামে এক গণিতবিদ রাজার মৃত্যদণ্ড কার্যকরের নথিতে স্বাক্ষর করেন। গ্যাসপা ছিলেন পূর্নাঙ্গ এক জ্যামিতিক। বিশেষ দক্ষতা ছিল ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিতে। স্থপতি ও প্রকৌশলীদের ভবন ও যন্ত্র নির্মাণের পদ্ধতির পেছনে অবদান ছিল মঞ্জের। তারা নকশাকে উলম্ব ও অনুভূমিক তলে প্রক্ষেপণ (project) করে। বস্তুটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত থাকে। সামরিক বাহিনীর কাছে মঞ্জের কাজের ছিল বিশেষ গুরুত্ব। তাই কাজের বড় অংশই বিপ্লবী সরকার রাষ্ট্রীয় গোপনীয় নথি হিসেবে ব্যবহার করে। পরবর্তী ন্যাপোলিয়নের সরকারও সে ধারা বজায় রাখে।

জঁ ভিক্টর পঁসলে ছিলেন মঞ্জের ছাত্র। ন্যাপোলিয়নের বাহিনীতে প্রকৌশলী হিসেবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় তিনি ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি সম্পর্কে জানতে পারেন। পঁঁসলের দূর্ভাগ্য। তিনি বাহিনীতেও ঢুকলেন, আর ন্যাপোলিয়নও যাত্রা করলেন রাশিয়ার দিকে। এটা ১৮১২ সালের কথা।

মস্কো থেকে ফেরার পথে ন্যাপোলিয়নের বাহিনী দুটি বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। একটি হলো কনকনে শীত। আরেকটি একইরকম ভয়ানক রুশ বাহিনী। এতে বাহিনী অনেক ছোট হয়ে যায়। ক্রাসনয়ের যুদ্ধে পঁসলেকে মৃত ভেবে সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে যায়। তবে মারা না গেলেও পরে রুশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন তিনি। রুশ কারাগারে পঁচতে পঁচতে পঁসলে জ্ঞানের নতুন শাখার সন্ধান পান: প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতি।

পঁসলের কাজের মাধ্যমে পনের শতকের শিল্পী ও স্থপতিদের কাজ পূর্ণতা পায়। এই শিল্পীদের মধ্যে আছে ফিলিপো ব্রুনেলেস্কি। আছেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, যিনি আনুপাতিক আকার (perspective) ধরে রেখে বাস্তব চিত্র আঁকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কোনো চিত্রে "সমান্তরাল" রেখারা মিলিয়ে যাওয়া বিন্দুর দিকে অগ্রসর হলে পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে, রেখারা কখনোই মিলিত হবে না। মেঝের বর্গ চিত্রে পরিণত হয় ট্রাপিজয়ডে। সবকিছু মৃদুভাবে বিকৃত হয়। তবে দর্শকের কাছে তা পুরোপুরি নিখুঁত লাগে। অসীম দূরের বিন্দুর বৈশিষ্ট্যই এটা। অসীমের শূন্য।

জোহানের কেপলার এই ধারণাটা কাজে লাগালেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, গ্রহরা উপবৃত্তাকার পথে চলে। অসীম দূরের ভাবনাকে তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে নিলেন। উপবৃত্তের আছে দুটি কেন্দ্র। যাদের নাম ফোকাস বা উপকেন্দ্র। উপবৃত্ত যত লম্বা হবে, উপকেন্দ্ররা থাকবে তত দূরে। সব উপবৃত্তেরই আছে এ বৈশিষ্ট্য। ধরুন আপনার কাছে উপবৃত্তাকার একটি দর্পণ (আয়না) আছে। এর একটি উপকেন্দ্রে একটি বাতি বসিয়ে তার আলোগুলো আরেক উপকেন্দ্রে মিলিত হবে। উপবৃত্ত যত লম্বাই হোক এ ব্যাপারটা ঘটবেই (চিত্র ২৯)।

মনে মনে কেপলার উপবৃত্তকে অনেক লম্বা করলেন। উপকেন্দ্রদুটিকে নিয়ে গেলেন অনেক অনেক দূরে। এরপর কল্পনা করলেন, একটি অপরটি থেকে অসীম দূরে। দ্বিতীয় উপকেন্দ্র অসীমের এক বিন্দু। হঠাৎ উপবৃত্ত হয়ে গেল পরাবৃত্ত। আগের যে রেখারা একটি বিন্দুতে মিলিত হলো তারা এখন হয়ে গেল সমান্তরাল। পরাবৃত্তও তাই এমন এক উপবৃত্ত, যার একটি উপকেন্দ্র আছে অসীমে (চিত্র ৩০)।

চিত্র ২৯: উপবৃত্তের ভেতরে আলোকরশ্মি

একটি ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে আপনি এটা সহজেই দেখতে পারবেন। একটি অন্ধকার কক্ষে যান। দেয়ালের কাছে কাছে দাঁড়িয়ে সোজা আলো ফেলুন তাতে। সুন্দর একটি গোল বৃত্ত দেখতে পাবেন। দেয়ালে প্রক্ষেপিত আলো তৈরি করেছে এ বৃত্ত। এবার লাইটের মাথা একটু করে ওপরে উঠাতে থাকুন (চিত্র ৩১)। দেখবেন, বৃত্ত লম্বা হয়ে ক্রমেই বড় থেকে আরও বড় উপবৃত্ত হয়ে যাচ্ছে। এরপর হঠাৎ দেখবেন, উপবৃত্ত নেই আর। হয়ে গেছে পরাবৃত্ত। ফলে কেপলারের অসীমের বিন্দু থেকে দেখা গেল, পরাবৃত্ত এবং উপবৃত্ত আসলে একই। এর মাধ্যমে সূচনা হয় প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতির। গণিতবিদরা এখানে দেখেন জ্যামিতিক আকৃতির ছায়া ও প্রক্ষেপণ। এর মাধ্যমে জানা যায় বহু গুপ্ত সত্য। যে সত্য উপবৃত্ত আর পরাবৃত্তের সমতুল্যতার চেয়ে শক্তিশালী। তবে সবকিছুই নির্ভর করে অসীমে অবস্থিত বিন্দুকে মেনে নেওয়ার মধ্যে।

চিত্র ৩০: উপবৃত্তকে বড় করলেই পাওয়া যায় পরাবৃত্ত

চিত্র ৩১: আলো জ্বেলে উপবৃত্ত ও পরাবৃত্ত দেখা যায়

জিরার ডেজার্গ ছিলেন সতের শতকের ফরাসি স্থপতি। প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতির প্রাথমিক এক অগ্রনায়ক। অসীমের বিন্দু কাজে লাগিয়ে তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নতুন উপপাদ্য প্রমাণ করেন। তবে ডেজার্গের সহকর্মীরা তাঁর লেখার অনেক শব্দ বুঝতে পারেননি। ফলে ধরে নিয়েছিলেন, লোকটা পাগল হয়ে গেছে। ব্যতিক্রমও আছে। ব্লেজ প্যাসকেলসহ কিছু গণিতবিদ ডেজার্গের কাজ এগিয়ে নিয়েছিলেন। তবে মানুষ তা ভুলে যায়।

জঁ ভিক্টর পঁসলের কাছে এসবের কোনো গুরুত্ব ছিল না। মঞ্জের ছাত্র হিসেবে পঁসলে কোনো চিত্রকে দুটি তলে প্রক্ষিপ্ত করার কৌশল শিখেছিলেন। আর যুদ্ধবন্দী হিসেবে হাতে ছিল প্রচুর অবসর সময়। কারাগারে বন্দী থাকার সময় তিনি অসীমের বিন্দু পুনরায় আবিষ্কার করেন। একে জোড়া দেন মঞ্জের কাজের সাথে। এর মাধ্যমে হয়ে যান প্রথম প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতিক। রাশিয়া থেকে ফেরার সময় সেদেশী একটি অ্যাবাকাস সঙ্গে নিয়ে আসেন। সময়ের তুলনায় যদিও সেটা পুরনো এক অদ্ভুত যন্ত্র। যাই হোক, এর মাধ্যমেই তিনি প্ররক্ষেপণমূলক জ্যামিতিকে উঁচু শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যান৭। তবে পঁসলের ধারণাই ছিল না যে প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতি শূন্যের রহস্যময় বৈশিষ্ট্য বের করে আনবে। কারণ এর জন্যত দ্বিতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। সেটি হলো জটিল৪ (সংখ্যার) তল। ধাঁধাঁর এ অংশের জন্য আমাদেরকে জার্মানি ফিরে যেতে হবে।

কার্ল ফ্রিদরিচ গাউসের জন্ম ১৭৭৭ সালে। অল্প বয়সেই মেধার স্বাক্ষর রাখা শুরু করেন তিনি।

তথ্যনির্দেশ

১। চীনা দর্শনে ইন ও ইয়াং হলো দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্য। ইন মানে খারাপ, অন্ধকার। আর ইয়াং ভাল, উজ্জ্বল।

২। এ সমীকরণকে সাজিয়ে পাই x2 + 1 = 0। বা x2 = - 1, যার অর্থ হলো কোন সংখ্যাকে বর্গ করলে (-১) পাওয়া যাবে। ১-কে বর্গ করলে ১ পাওয়া যায়। (-১)-কে বর্গ করলেও তাই। তাহলে (-১) কীভাবে পাব? আসলে এমন কোনো বাস্তব সংখ্যা নেই। তবে হ্যাঁ, সংখ্যা আছে। তার নাম কাল্পনিক সংখ্যা। নামটা 'কাল্পনিক' হলেও এ সংখ্যারাও আছে বাস্তব জগতেই।

বিস্তারিত পড়ুন - কাল্পনিক সংখ্যা কি আসলেই কাল্পনিক?

<https://www.statmania.info/2019/07/imaginary-number.html>

৩। যেভাবে বিন্দু থেকে 'বিস্ফোরণের' মাধ্যমে সৃষ্ট মহাবিশ্বের ধারণাকে ফ্রেড হয়েল ব্যঙ্গ করে নাম দেন 'বিগ ব্যাং'। এ নামটিই পরে টিকে যায়।

৪। বাস্তব ও কাল্পনিক সংখ্যার মিশ্রণকে জটিল সংখ্যা বলে। এই যেমন 3 + 4i সংখ্যায় 3 হলো বাস্তব আর 4 কাল্পনিক অংশ।

৫। লিবনিজই প্রথম দেখান, আমাদের চেনাজানা দশভিত্তিক বা দশমিক সংখ্যাকে দুটি অঙ্ক (০ ও ১) দিয়েও লেখা যায়। এভাবে ০ = ০, ১ = ১, ২ = ১০, ৩ = ১১, ৪ = ১০০ ইত্যাদি। এদেরকেই বলে বাইনারি বা দ্বিমিক সংখ্যা। তিনি আরও দেখান, দশমিক সংখ্যার মতোই দ্বিমিক সংখ্যার ক্ষেত্রেও যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগসহ সব গাণিতিক অপারেশন করা যায়।

৬। ইহুদি ধর্মে হোলি স্পিরিট বা পবিত্র আত্মাকে স্বর্গীয় শক্তি, গুণ বা প্রভাব মনে করা হয়। খৃষ্টান ধর্মের একটা বড় অংশে একে তাদের ত্রিত্ববাদ মতবাদের তৃতীয় ব্যক্তি মনে করা হয়। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মে রুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা মনে করা হয় হযরত জিবরাইলকে (আ)।

৭। পঁসলের প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতি গণিতের পুরনো এক অদ্ভুত ধারণা ফিরিয়ে আনে। এর নাম দ্বৈত নীতি। স্কুলে আমরা শিখই, দুটি বিন্দু যোগ করে রেখা পাওয়া যায়। তবে অসীমের বিন্দু মেনে নিলে দুটি রেখা একটি বিন্দু তৈরি করে। বিন্দু ও রেখা একে অপরের দ্বৈত রূপ। ইউক্লিডীয় দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির প্রতিটি উপপাদ্যকে দ্বৈত উপায়ে প্রমাণ করা যায় প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতিতে। ফলে প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতির সমান্তরাল মহাবিশ্বে এক গুচ্ছ নতুন উপপাদ্যের জন্ম হলো।